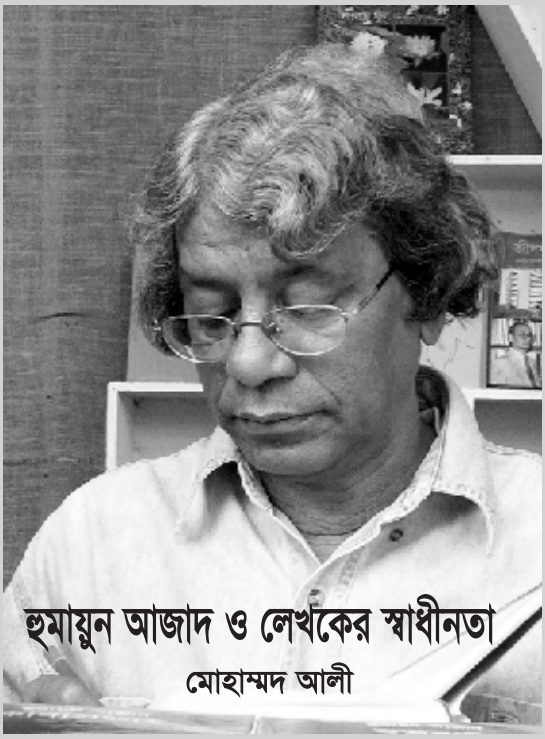

হুমায়ুন আজাদ ও লেখকের স্বাধীনতা

মোহাম্মদ আলী

কার্লাইল দিয়ে শুরু করি। 'তোমার মতামত আমি সমর্থন করি না, কিন্তু তোমার মত প্রকাশের অধিকার রক্ষায় আমি জীবন দিতে প্রস্তুত।' আমরাও কি লেখকের স্বাধীনতার জন্য এভাবে জীবন দিতে প্রস্তুত? লেখকের স্বাধীনতা কি? লেখকের স্বাধীনতা কাকে বলে? লেখকের স্বাধীনতা বলতে বুঝায় অবাধ স্বাধীনতা, যার বিনিময়ে একজন লেখক অবাধে লিখতে, বলতে ও মত প্রকাশ করতে পারেন। বাংলাদেশে স্বাধীনতা অত্যন্ত সীমিত। রাষ্ট্র স্বাধীন হলেই লেখক স্বাধীনতা পান না। যে কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুগত হলেই কেবল লেখক রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত সুবিধা লাভ করতে পারেন। লেখকের স্বাধীনতা নির্ভর করে লেখক কতটা রাষ্ট্রের ও সরকারের অনুগত তার ওপর। সুতরাং লেখকের স্বাধীনতা সেই অর্থে বদ্ধ জলাশয়ের মতো সীমাবদ্ধ। কারণ প্রগতিশীল ও নিষ্ঠাবান লেখক কখনো রাষ্ট্রের আনুকূল্য নিয়ে বা অনুগত থেকে সাহিত্য রচনা করেন না। কারণ তার কাছে আদর্শের চেয়ে মহৎ আর কিছু নেই। বরং তিনি যা দেখেন, যা বিশ্বাস করেন, তাই লিখবেন অকপটে। কিন্তু প্রশ্ন হল তা কি সম্ভব? শাসকবর্গ স্বাধীনতা হরণ করে সক্রেটিসকে বিষপানে হত্যা করেছিল, ব্রুনোকে পুড়িয়ে মেরেছিল, গ্যালিলিওকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। বৃটিশশাসিত তৎকালীন ভারতে অনেক লেখকের ওপর নেমে এসেছিল শাসকদের দমন–পীড়ন আর নির্মম নির্যাতন। পাকিস্তান আমলে বহু দমন–পীড়নের ঘটনা ঘটেছে। নিষিদ্ধ হয়েছে বযলুর রহমানের 'মানব মনের আজাদী', ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের সমরেশ বসু'র 'প্রজাপতি' নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়ে মামলা করেছিলেন জনৈক অমল মিত্র। স্বাধীন বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হয়েছিল হুমায়ুন আজাদের 'নারী', তসলিমা নাসরিনের 'লজ্জা' ও 'ক' এবং ভারতে তাঁর 'দ্বিখণ্ডিত' নিষিদ্ধ করা হয়।

বাংলাদেশের লেখকদের মাথার ওপর সাম্প্রদায়িকতার খড়্গ ঝুলছে। হুমায়ুন আজাদ হয়েছিলেন এর নির্মম শিকার। হুমায়ুন আজাদের 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' নিষিদ্ধ করার পাঁয়তারা চলেছিল। তিনি চলতি হাওয়ার বিপরীতে দাঁড়িয়ে বুদ্ধিবৃত্তি ও মননশীল চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কলম ধরেছিলেন। কারো প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে লেখেন নি। প্রায়শই অনেক লেখকের সঙ্গে তাঁর কলমযুদ্ধ হত। প্রয়াত আহমদ ছফা ও ফরহাদ মজহারসহ বহু লেখকের সঙ্গে তাকে কলমযুদ্ধ বা বাকযুদ্ধ করতে দেখা গেছে। কোন লেখককে তিনি দেবতার আসনে বসাতেন না, আবার ছুঁড়েও ফেলে দিতেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, বেগম রোকেয়া ও অন্য লেখকদের সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন ছিল প্রচলিত ধারা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যেকোনো লেখা বস্তুনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করার পক্ষে ছিলেন তিনি, নিছক ভাগাবেগে আপ্লুত হয়ে নয়।

'অরুণিমা' নামে তাঁর প্রবচনগুচ্ছ বেরুবার পর সৈয়দ শামসুল হক তা নিয়ে বিতর্ক তোলেন। কবি শামসুর রাহমান, সৈয়দ হকের লেখার জবাব দিয়েছিলেন। 'নারী' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২ সালে। বইটি প্রকাশিত হবার পর তিনি আলোচনা–সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন। গ্রন্থটি সাড়ে চার বছর নিষিদ্ধ ছিল। কেন গ্রন্থটি নিষিদ্ধ হয়েছিল? হুমায়ুন আজাদ এক সাক্ষাৎকারে বলেন– 'ইসলামী ফাউন্ডেশনের পরিচালক আর একজন দ্বীনে দাওয়াত বিভাগের ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক, তারা দুজন আমার বই থেকে চৌদ্দটি বাক্য উদ্ধার করেছে এবং বলেছে যে, বইটি অশ্লীল, বইটি ইসলামবিরোধী, বইটি পুরুষ ও নারীর মধ্যে কলহ বাধাতে চায়, বিশেষ করে এই বই মুসলমানের ধর্মানুভূতিতে আঘাত দিয়েছে, সেই জন্য বই বাজেয়াপ্ত করা যায়। এত বড় বই পড়ার মতো ধৈর্য তাদের ছিল না। তার মাত্র চৌদ্দটি বাক্য উদ্ধৃতি করেছে, উদ্ধৃত করেই তারা পরামর্শ দিয়েছে যে, বইটি বাজেয়াপ্ত করা যায়।

যে বাক্যগুলো তারা উদ্ধৃত করেছে তার কোনটিই আপত্তিকর নয়। যেমন সৌদি আরবে নারী স্বাধীনতা নেই, ১৯৯১ সালে সৌদি আরব সরকার মেয়েদেরকে ঘর থেকে বের করে এনে সেবিকার দায়িত্ব দেয়, আবার যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যায় তখন ঘরে ঠেলে দেয়। এই ধরনের চৌদ্দটি বাক্য তারা উদ্ধার করেছে, যদিও এর চেয়ে মারাত্মক বাক্য বইটিতে অনেকই আছে।... সরকার আমাকে কখনো জানায়নি যে, তোমার বইটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তবে প্রধান কারণ দেখিয়েছে মুসলমানদের ধর্মানুভূতিতে আঘাত দেয়া।[১] দীর্ঘদিন ঝুলে থাকার পর হাইকোর্টের নির্দেশে অবশেষে বইটির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়।

তিনি আরও লিখেছেন, 'পুরুষ সাধারণত প্রতারণাই করে এসেছে নারীকে। তবে উনিশশতক থেকে একগোত্র পুরুষ লড়াই করেছেন নারীর পক্ষে।'[৩] পুরুষ উদ্ভাবন করছে নারী সম্পর্কে একটি বড় মিথ্যা, যাকে সে বলেছে 'চিরন্তনী নারী'। তাকে বলেছে দেবী, শাশ্বত, কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী অর্ধেক কল্পনা। কিন্তু পুরুষ চেয়েছে 'চিরন্তনী দাসী'। পশ্চিমে নারীরা শোষিত, তবে মানুষ–পুরুষ দ্বারা শোষিত, আমাদের অঞ্চলে নারীরা শোষিত পশু–পুরুষ দ্বারা।'[৪] স্বাভাবিকভাবেই 'পশু–পুরুষ' নারী গ্রন্থটি পড়ে লেখকের উপর ক্ষিপ্ত হবেনই।

'নারী'–তে তিনি আরও লিখেছেন– 'নারী বইটি আমি লিখেছি মানুষের এক বড়ো অংশের ওপর থেকে পুরুষতান্ত্রিক সমস্ত নিষেধ তুলে নেয়ার জন্য; নারীকে নিষিদ্ধ বস্তু থেকে মানুষের অধিকার দেয়ার জন্যে; আমাদের অন্ধকার অঞ্চলের সমস্ত প্রথার অবসান ঘটানোর জন্য।'[৫] মূলত শাসকগোষ্ঠী ছাড়া প্রায় সকলেই কোনো না কোনোভাবে শোষিত। তবে নারী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ শোষণের শিকার। একদা নারীশোষণ প্রত্যক্ষ করে মাও সেতুং বলেছিলেন, 'বিপ্লবের আগে চীনের পুরুষদের বইতে হতো সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের তিনটি পর্বত, আর চীনের নারীদের বইতে হতো চারটি পর্বত–চতুর্থটি পুরুষ।'[৬]

তিনি অবহেলিত নারীদেরকে নিয়ে লিখে নানানভাবে সমালোচিত ও অনেকের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। 'নারী'তে কি আছে? সামান্য কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হল: 'নারী সম্ভবত মহাজগতের সবচেয়ে আলোচিত প্রাণী; কথাটি ভার্জিনিয়া উলফের, যিনি নিজের বা নারীর জন্য একটি নিজস্ব কক্ষ চেয়েছিলেন, কিন্তু পাননি। এই আলোচনায় অংশ নিয়েছে প্রতিপক্ষের সবাই। শুধু যার সম্পর্কে আলোচনা সে-ই বিশেষ সুযোগ পায়নি অংশ নেয়ার। প্রতিপক্ষটির নাম পুরুষ, নিজে বানানো অলীক আর বিধাতার পার্থিব প্রতিনিধি, আর পুরুষ মাত্রই প্রতিভাবান, তার বিধাতার চেয়েও প্রতিভাদীপ্ত।'[২] তিনি আরও লিখেছেন, 'পুরুষ সাধারণত প্রতারণাই করে এসেছে নারীকে। তবে উনিশশতক থেকে একদল পুরুষ লড়াই করেছেন নারীর পক্ষে।'[৩] পুরুষ উদ্ভাবন করছে নারী সম্পর্কে একটি বড় মিথ্যা, যাকে সে বলেছে 'চিরন্তনী নারী'। তাকে বলেছে দেবী, শাশ্বত, কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী, অর্ধেক কল্পনা। কিন্তু পুরুষ চেয়েছে 'চিরন্তনী দাসী'। পশ্চিমে নারীরা শোষিত, তবে মানুষ–পুরুষ দ্বারা শোষিত, আমাদের অঞ্চলে নারীরা শোষিত পশু–পুরুষ দ্বারা।'[৪] স্বাভাবিকভাবেই 'পশু–পুরুষ' নারী গ্রন্থটি পড়ে লেখকের উপর ক্ষিপ্ত হবেনই।

সেকো তোরো বলেছেন, নারীরা 'ক্রীতদাসের ক্রীতদাসী।'[৭] হুমায়ুন আজাদ প্রত্যক্ষ করেছেন, 'এ অঞ্চলের দেবী শব্দটি দাসীরই সুভাষণ।'[৮] '...বাঙলায় নারীরা এখনো পশুদের দাসী।'[৯] '...পুরুষতন্ত্র নারীর যে ভাবমূর্তি তৈরি করেছে কয়েক সহস্রকের সাধনায়, তাতে 'নারী' বললে মানুষ বোঝায় না; বোঝায় এক ধরনের মানুষ, যা বিকৃত, বিকলাঙ্গ, অতিরিক্ত, বা না–পুরুষ।'[১০] এমনিভাবে নিজের মত ও বিভিন্ন মনীষী যেমন, দ্য বোভেয়ার, রবীন্দ্রনাথ, এলেন সিজো, ওয়েবস্টার, সুধীন্দ্রনাথ, টাইমসসহ আরও অনেক লেখকের মত তুলে নিয়ে এসেছেন। '...ইহুদি, খ্রিস্টান, মুসলমানের ধর্মগ্রন্থে হাওয়া বা ইভের আগেই আদমকে তৈরি ক'রে উল্টে দেয়া হয়েছে মানুষ জন্মের স্বাভাবিক রীতি; নারীকে জন্ম দেয়া হয়েছে পুরুষের দেহ থেকে, অর্থাৎ পুরুষই হয়ে উঠেছে নারীজাতির মাতা।'[১১] এভাবে নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি ও ধর্মগ্রন্থসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন, ফলে জ্ঞানপিপাসু পাঠক অনেক অজানা তথ্য জানতে পারেন। প্রতিক্রিয়াশীলেরা নারীদের কেবল ভোগের সামগ্রী মনে করে, ফলে যখনই স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলা হয়,

তখনই তারা সেটিকে অপরাধ বলে গণ্য করে আর সেটাই স্বাভাবিক। 'নারী'তে কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আঘাত দেওয়া হয়নি। প্রতিক্রিয়াশীলদের মর্মমূলে আঘাত হেনেছেন তিনি। আর এ জন্যই গ্রন্থটি রোষানলে পড়েছিল এবং নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। লেখকের স্বাধীনতার ওপর, কলমের স্বাধীনতার উপর আঘাত হানা হয়েছিল। হুমায়ুন আজাদের বই প্রকাশ পেলেই নিষিদ্ধ হবার আতঙ্ক থাকত। কারণ তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা ও পশ্চাৎপদতাবিরোধী। তিনি যা দেখতেন এবং বিশ্বাস করতেন তাই লিখতেন। সত্যকে তুলে ধরতে তিনি কখনো এতটুকু পিছপা হননি।

কি আছে 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' উপন্যাসটিতে? বইটিতে 'ইসলাম ও মুসলমান' সম্পর্কে আপত্তিকর ভাষা প্রয়োগের অভিযোগ করেছেন মৌলবাদীরা। স্বাধীনতাবিরোধীদের কটাক্ষ করা যদি 'ইসলাম ও বাংলাদেশ' বিরোধিতা হয়ে থাকে তাহলে কিছু বলার নেই। এ বইটি ওদের কাছে আতঙ্ক কেন? ১৯৬০ এর দশকে বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানের উপনিবেশ। তখন একটি উর্দুগানে নিরন্তর ঝালাপালা হতো আমাদের কান, যার প্রথম পঙক্তি ছিল পাক সার জমিন সাদ বাদ। সামরিক শাসন আর উর্দু জাতীয় সঙ্গীতে বাংলাদেশ ছিল পীড়িত। ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা সৃষ্টি করি একটি স্বাধীন দেশ : বাংলাদেশ। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল অন্ধকারের শক্তিরাশি আমাদের সামনের দিকে এগোতে দেয়নি, বরং নিয়ে চলেছে মধ্যযুগের দিকে; বাঙলাদেশকে করে তুলেছে একটি অপপাকিস্তান। মৌলবাদ এখন দিকে দিকে হিংস্ররূপ নিয়ে দেখা দিচ্ছে; ত্রাসে ও সন্ত্রাসে দেশকে আতঙ্কিত করে তুলছে।'[১২] তিনি সামাজিক ঘনীভূত সমস্যাপুঞ্জ নিজ চোখে দেখে তারই বাস্তব চালচিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর সাহিত্য আলুসাহিত্য বা বিকি–কিনির পণ্যসাহিত্য ছিল না।

প্রতিক্রিয়াশীলদের আরও আতঙ্কিত হবার কারণ গ্রন্থটি 'উৎসর্গ ১৯৭১' লাল কালিতে। তাতে তিনি কী বুঝাতে চেয়েছেন সচেতন সকলেই সহজেই সেটি বুঝতে পারেন। প্রথম লাইনের দুটি শব্দ বিশ্লেষণ করা যাক ইসলামিকে তিনি 'ইছলামি', মুসলমানকে তিনি 'মুছলমান' ব্যবহার করেছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল এবং ধর্ম ব্যবসায়ীদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। বাংলা সাহিত্য ও বিশ্বের কালজয়ী সাহিত্যে বিশেষত উপন্যাসে বিভিন্ন রূপক ব্যবহার করা হয়, এটাই স্বাভাবিক রীতি। আসলে মৌলবাদীদের মর্মাহত হবার কারণ '...জামাঈ জিহাদে ইছলাম পার্টি।... হযরত আবু আলা মওদুদি... কিতাব পড়ে আমি বুঝতে পারি খাটি ইছলামকে... আমি পাক হয়ে উঠি, জিহাদি হয়ে উঠি।'[১৩] একটি মহল সমাজকে কীভাবে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে, উপন্যাসে সেই বিষয়টিই তিনি তুলে ধরেছেন। এ উপন্যাস তাদের চোখে অশ্লীল হওয়াটাই স্বাভাবিক, এখানে তিনি ধর্মান্ধদের চরিত্রের স্বরূপ উৎঘাটন করেছেন। এ উপন্যাসটি প্রতিক্রিয়াশীলতার স্বরূপ উন্মোচনের দলিল। ফলে এ উপন্যাসকে তারা অশ্লীল বলবেন, কারণ এর মধ্য দিয়ে তাদের কুৎসিত চেহারা ফুটে উঠেছে। প্রসঙ্গত বলতে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের পোষাকী ভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সাধারণের মুখের ভাষা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। হুমায়ুন আজাদ সেই ভাষায় লিখেছেন, প্রতিক্রিয়াশীলরা যেভাবে আচরণ ও বসবাস করে সেটিই লিখেছেন। এর বাইরে লিখলে সেটি হত যান্ত্রিক। কোনো কিছু বুঝতে হলে মূলানুগভাবে বুঝতে হবে, আংশিক বা খণ্ডিতভাবে কোনো কিছু দেখলে মূল থেকে বিচ্ছিন্নতা দেখা দেবে। লেখক নিজে বলেছেন– যে নায়ককে দিয়ে তিনি আরও খারাপভাবে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি শেষ করেছেন... 'দেখতে পাচ্ছি সোনার বাঙলাকে, আমার বা পাশে আমার কণকলতা বলে, 'চারপাশ কি সবুজ'; আমি বলি, 'অন্ধকারেও আমি গাড়ি থামাই, কণকলতাকে বুকে ক'রে নামাই, সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে নিজেদের জড়িয়ে ধরে চুমো খেতে দেখি সমুদ্রের ভেতর

তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস পাক সার জমিন সাদ বাদ প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিচ্ছবির নিখুঁত চিত্রায়ণ। সত্য যদি অশ্লীলতা হয়, আমি সেই অশ্লীলতার পক্ষে। তাহলে কাউকে হত্যা করা, ধর্ষণ করা কি শালীনতা; হত্যা, ধর্ষণ প্রতিক্রিয়াশীলতা ও শোষণের চেয়ে বড় আর কোনে অশ্লীলতা নেই। তিনি লেখক হিসেবে লেখকের স্বাধীনতা সৃষ্টি করার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছিলেন। আর তা করতে গিয়ে তাঁকে দিতে হয়েছে রক্ত, দিতে হয়েছে অমূল্য জীবনও।

থেকে সবুজের মাঝখানে একটি লাল টকটকে সূর্য উঠেছে।'[১৪] ঔপন্যাসিক হতাশাবাদী বা নৈরাজ্যবাদী হলে উপন্যাসটি ভিন্নভাবে শেষ করতেন। কিন্তু তিনি বিপুল আশাবাদী ও পরিবর্তনে আস্থাশীল বলেই অবশেষে আশার আলো দেখেছেন। দেখবেনই তো কারণ, 'আমাদের কিছু নেই, কিন্তু সম্ভাবনা তো আছে?'[১৫] তিনি প্রচলিত ধারার সাহিত্যের ঘোর বিরোধী ছিলেন। প্রতিক্রিয়াশীলরা জানে না রূপক না থাকলে সাহিত্য বাঁচে না, 'যেমন কেবল প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয় কিন্তু মন ছাড়া মানুষ হবার কোনো বিকল্প পথ নেই।'[১৬] বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'বাঙলা সাহিত্য সব সময়ই সাধারণত বোঝাই থেকেছে মানবিক উপাদানে, এখানে এতো শস্তা ও সুলভ যে দু-হাত ছানতে কেউ উৎসাহ বোধ করবে না! তাই এ-সাহিত্য মানবিক উপাদানে অনেক সময় এতোটা বোঝাই হয়ে ওঠে যে সমস্ত ব্যাপারটিতে মনে হয় ঘিনঘিনে, যদিও সাধারণ উপভোগীরা ভালোবাসেন ওই মানবিক নোংরার মধ্যে ডুবে থাকতেই। বাঙলা সাহিত্য ভাবালুতাপ্রবণ। ভাবালুতাই শিল্পকলা বলে গণ্য এখানে। আমাদের দুটি নোংরা শব্দ 'সুখ-দুঃখ'। মধ্যবিত্ত বাঙালির মনে রয়েছে একটি দুরারোগ্য দাদ, যা চুলকোলে পাওয়া যায় বিশেষ আনন্দ। ওই দাদটির নাম 'সুখ-দুঃখ'। যে লেখক বাঙালিচিত্তের ওই দাদটি চুলকানোর যতো বেশি প্রতিভা রাখেন, তিনিই ততো বেশি আদরণীয়।'[১৭] তিনি দাদ চুলকোনের সাহিত্য রচনা করেন নি, তিনি রচনা করেছেন জীবনঘনিষ্ঠ সাহিত্য, যা জীবনকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়, বলে জীবন তুমি দেখ নিজেকে, শিক্ষা নাও জীবন থেকে, সমাজ থেকে এবং মানুষের কাছ থেকে।

হুমায়ুন আজাদ পাক সার জমিন সাদ বাদ না লিখে, হালকা বা স্থূল কোনো উপজীব্য করে যে কোনো উপন্যাস লিখলে হয়তো কারো শত্রু হতেন না, পসরাও করতে পারতেন। কিন্তু তিনি অলস-সাহিত্য রচনার লেখক নন। যেখানে পচন ধরেছে সমাজের, সেখানে তিনি অন্ধের মতো পথ হাতড়ে বেড়াবেন কেন? তিনি তো জানেন, এ মুহূর্তে তাঁর প্রধান দায়িত্ব কী। প্রতিক্রিয়াশীলদের মুখোশ উন্মোচন, সত্যকে সত্য বলা এবং সৎ সাহিত্য রচনা করা যদি অপরাধ হয়, সেই অপরাধ একজন সত্যিকারের লেখক করবেন এবং সেইটাই হওয়া উচিত। হুমায়ুন আজাদ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও অন্ধকারেরর অপশক্তিকে চিহ্নিত করেছিলেন- এটাই ছিল তাঁর অপরাধ। তিনি প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে কলমযুদ্ধের সূচনা করেছিলেন। স্বাধীনতার শত্রু ও পরগাছাদের বিরুদ্ধে তিনি যুক্তির খাপখোলা তরবারি ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস পাক সার জমিন সাদ বাদ প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিচ্ছবির নিখুঁত চিত্রায়ণ। সত্য যদি অশ্লীলতা হয়, আমি সেই অশ্লীলতার পক্ষে। তাহলে কাউকে হত্যা করা, ধর্ষণ করা কি শালীনতা; হত্যা, ধর্ষণ প্রতিক্রিয়াশীলতা ও শোষণের চেয়ে বড় আর কোনে অশ্লীলতা নেই। তিনি লেখক হিসেবে লেখকের স্বাধীনতা সৃষ্টি করার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছিলেন। আর তা করতে গিয়ে তাঁকে দিতে হয়েছে রক্ত, দিতে হয়েছে অমূল্য জীবনও। তবু তিনি সৃষ্টিস্বপ্নের স্বপ্ননীল সিঁড়ি বেয়ে হেঁটেছেন, বাস্তবতা ও কঠিনকে ভালোবেসেছেন। পরাধীনতার মধ্যেও সৃজনশীলভাবে স্বাধীনতার ফল্গুধারা তিনি সৃষ্টি করেছেন; সেটি সামনের দিকে এগিয়ে নেবার দায়িত্ব আমাদের। তিনি নষ্ট সমাজ প্রত্যক্ষ করেছেন, তাই তিনি বলেছেন, 'সবকিছু নষ্টদের অধিকারে' চলে যাবে? আর তিনি নীরবে তা সহ্য করবেন, তা হতে পারে না।

লেখকের স্বাধীনতার সঙ্গে গণতন্ত্র এবং সমাজ পরিবর্তনের বহুমাত্রিক যোগসূত্র রয়েছে। যেখানে গণতন্ত্র কোন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি, সামাজিক পতিষ্ঠানগুলো বিকশিত হয় নি, সেখানে লেখক স্বাধীনতা কীভাবে লাভ করবেন? গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করা ছাড়া লেখকের স্বাধীনতা আশা করা বাতুলতা মাত্র।

গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির উপর দাঁড়ালে, জবাবদিহিতা থাকলে, শিল্প-সাহিত্যে তাঁর ছোঁয়া লাগবে স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু যে দেশে, সমাজে, রাষ্ট্রে, সংবিধানে গণতন্ত্র বন্দি হরিণীর মতো ভয়-বিহবল সেখানে লেখকের স্বাধীনতা কি আসমান থেকে নামবে? আর তা কেবল একজন লেখকের পক্ষে এককভাবে অর্জন করা সম্ভব নয়, কারণ স্বাধীনতা যাদুর বাঁশি নয়, সমগ্র প্রচেষ্টার ফল। সমাজ প্রগতির বাতাবরণ বিস্তৃত না হলে লেখকের স্বাধীনতাও সুদৃঢ় হয় না। তাই বলে কি লেখক নির্বিকার থাকবেন, বোবার মতো হত-বিহ্বলভাবে চেয়ে থাকবেন? দেশের সাধারণ মানুষের অধিকার আদায় ও নিজের স্বাধীনতার জন্য লেখককে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়। অনেক লেখক রাষ্ট্রীয় তোতা পাখি, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তারা স্বাধীনতা লাভ করেন। নিঃশর্তভাবে কাজ করার জন্য রাষ্ট্র উপঢৌকন দেয়। দেশে দেশে, কালে কালে এমন নানা ঘটনা প্রায়ই ঘটে। ঐ সব লেখক নিজেদের স্বাধীন ও নির্ভীক বলে দাবি করলেও মূলত তা দাসত্ব বরণ।

তিনি ধর্মকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, 'আদিম মানুষদের অন্ধ আদিম কল্পনা, আর পরবর্তী অনেকের সুপরিকল্পিত মিথ্যাচার, কখনো কখনো মত্ততা, নানাভাবে বিধিবদ্ধ হয়ে নিয়েছে যে–বিচিত্র রূপ, তাই পরিচিত ধর্ম নামে।'[১৯] অন্যদিকে বার্ট্রান্ড রাসেল, আমি কেনো খ্রিস্টান নই বইটি'তে বলেছেন, 'সব ধর্মই ক্ষতিকর ও অসত্য।[২০] 'সাধারণত: আমরা যাহাকে 'ধর্ম' বলি তাহা হইল মানুষের কল্পিত ধর্ম।'[২১]

যারা রাষ্ট্র বা সরকারের পোষা পাখির মতো নন, তাদের উপর চালানো হয় নিপীড়ন–নির্যাতন। হুমায়ূন আজাদ ছিলেন স্বাধীন, পুতুল নাচের সুতো ছিল না তাঁর পিছনে। তিনি মুক্তচিন্তার স্বাধীন ভূবন গড়ে তুলেছিলেন–যা দিয়ে তিনি অন্ধকারাচ্ছন্নদের আলোকিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি জ্ঞানশক্তি ও মানসিক শক্তিবলে লেখকের স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন। তাঁর মধ্যে ছিল স্পার্টাকাসের মতোই সাহসের বীজ। তিনি শাসকগোষ্ঠী ও প্রতিক্রিয়াশীল কারোরই রক্তচক্ষুর ভয়ে ভীত ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন সকল অন্যায়, অসত্য, অন্ধকার ও শোষণের বিরুদ্ধে বারুদের বিস্ফোরণ। যুক্তি ও বিবেক দিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে সাধারণ ভাগ্যাহত নিপীড়িত মানুষ, নারী অধিকার ও সামাজিক বৈষম্যের চিত্র। তিনি মুখোশ খুলে দিয়েছেন বিপদগামী পথভ্রষ্ট রাজনীতিবিদ ও নপুংশুক বুদ্ধিজীবীদের। তিনি দেখিয়েছেন মৌলবাদ পরিবেষ্টিত বাংলাদেশে কীভাবে অশুভ শক্তি গোখরো সাপের ফনা তুলছে। তিনি এ নষ্ট সমাজে মুক্তচিন্তার দীপশিখা জ্বেলে গেছেন।

একজন বাস্তববাদী ও সচেতন লেখক হিসেবে হুমায়ুন আজাদ যে সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন, কেবল ভবিষ্যৎ নতুন প্রজন্ম পারে সেই স্বপ্ন পূরণ করতে। প্রতিক্রিয়াশীলরা তাঁর কাছে ছিল প্রতিপক্ষ। কারণ তাঁর কলম ছিল ধারালো বর্শার ফলকের মতো। ফলে তাঁর মিত্ররা তাঁকে না চিনলেও শত্রুরা চিনতে ভুল করেনি। হায়নারা শাণিত তরবারি দিয়ে তাঁকে রক্তাক্ত করেছে এবং অবশেষে জীবনও হরণ করেছে। কিন্তু তিনি কলমযুদ্ধ থেকে, স্বাধীনতা-লালিত স্বপ্নজগৎ থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হন নি, এতটুকু সরে আসেন নি। তিনি সক্রেটিস–ব্রুনোর পরিণতি গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন কিন্তু বর্ণচোরা খলের পরিণতি গ্রহণ করেন নি। এখানেই তাঁর মহত্ব ও বিশিষ্টতা। কেবল প্রতিবাদী লেখক হিসেবে নয়, সৃষ্টির বৈচিত্র্যে এবং শৈল্পিক উৎকর্ষতায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন অনন্য।

এ দেশে লেখকের স্বাধীনতা নেই, নেই কলমের স্বাধীনতা, নেই নারী স্বাধীনতাও। সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা তো সোনার পাথর বাটি। শাসকগোষ্ঠী সকলকে দাসে পরিণত করে রেখেছে, বাকিদের করে রেখেছে পুতুল। পুতুলেরা এখন অনেক বেশি শক্তিশালী, তাদের অভাব নেই অর্থ–বিত্তের, অভাব নেই ক্ষমতার। তারা সদা–সর্বদা কলের পুতুলের মতো নাচে কারণ অকারণে। সুতো যেদিকে ঘোরানো হয়, পুতুল সেদিকেই ঘোরে, সেদিকেই চোখ মেলে। কিন্তু যিনি সত্যিকার স্বাধীনচেতা লেখক তিনি কি করবেন? তিনি কখনো পুতুলের মতো নাচতে, হাসতে ও খেলতে পারবেন না। তিনি অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করবেন, বৈষম্য দেখলে জ্বলে উঠবেন, সেটাই স্বাভাবিক। নিজের বিবেক ও কলম অন্যের হাতে তুলে দেবেন না। কোনো প্রতিকূলতার কাছে কখনো মাথা নত করবেন না। হুমায়ূন আজাদ ছিলেন এ রকম একজন নির্মোহ ব্যক্তিত্ব। তাই তিনি বলেছেন '... কতো তুচ্ছ মানুষ..., বিশেষ করে বাঙলাদেশে, ...রাষ্ট্রকে চিৎ করছে, সমাজকে উপুড় করছে, কাৎ করছে, গর্ভবতী করছে, ...বছরের পর বছর ধ'রে আমরা যুদ্ধ করতে পারি, কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে স্বপ্ন দেখা সম্ভব নয়। আজ দল বেঁধে নেমে সারা শহর পুড়িয়ে দিতে পারি, ...কিন্তু আমরা দল বেঁধে এক হাজার উৎকৃষ্ট কবিতা লিখে উঠতে পারি না। কবিতার কথা ছেড়ে দিই, রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীকে গরু সম্পর্কে একটি রচনা লিখতে দিলে তারা হয়তো লিখে উঠতে পারবেন না, কিন্তু হেলিকপ্টারে সারা দেশ ঘুরে দশখানা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে পারবেন।'[১৮] দেশ যখন অন্ধকারের কালে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, তখন তিনি হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো, স্ফূলিঙ্গের মতো ঝলকানি দিয়েছেন। সেই স্ফূলিঙ্গ অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে এ দেশকে একদিন আলোকময় করে তুলবে। তিনি প্রতীকী অর্থে উঁচুস্তরে আসীন ব্যক্তিবর্গের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন

তুলেছেন। আর তুলবেন না–ই বা কেন?

তিনি ধর্মকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, 'আদিম মানুষদের অন্ধ আদিম কল্পনা, আর পরবর্তী অনেকের সুপরিকল্পিত মিথ্যাচার, কখনো কখনো মত্ততা, নানাভাবে বিধিবদ্ধ হয়ে নিয়েছে যে–বিচিত্র রূপ, তাই পরিচিত ধর্ম নামে।'[১৯] অন্যদিকে বার্ট্রান্ড রাসেল, আমি কেনো খ্রিস্টান নই বইটি'তে বলেছেন, 'সব ধর্মই ক্ষতিকর ও অসত্য।[২০] 'সাধারণতঃ আমরা যাহাকে 'ধর্ম' বলি তাহা হইল মানুষের কল্পিত ধর্ম।'[২১]

আরজ আলীর চিন্তাদর্শন থেকে জানতে পারি, 'বিজ্ঞান মানুষকে পালন করে। কিন্তু ধর্ম মানুষকে পালন করে না, বরং মানুষ ধর্মকে পালন করে এবং প্রতিপালনও।'[২২] এ প্রসঙ্গে গোর্কি বলেছেন, অবশ্য ঈশ্বর বলতে আমি বুঝি ন্যায়, সত্য এবং মহত্বের জন্য মানুষের অনিবার্য সংগ্রামকেই, অপর কিছুকে নয়।' ধর্ম সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদ আরও বলেছেন, 'ধর্মের ইতিহাস পাঁচ হাজার বছরের, এর মধ্যে অজস্র ধর্ম প্রচারিত হয়েছে ও বাতিল হয়ে গেছে; কিন্তু মানুষ আছে কোটি বছর আগে থেকে, টিকে থাকবে বহু কোটি বছর। পৃথিবী ধ্বংসের আগে মানুষ হয়তো অন্য কোথাও পাড়ি জমাবে;– মানুষের সম্ভাবনা অনন্ত, দেবতাদের থেকে মানুষ অনেক বেশি প্রতিভাবান।[২৩] সাধারণত দেখা যায়, 'প্রশ্নকর্তা সকল সময়ই জানিতে চান– সত্য কি? তাই সত্যকে জানিতে পারিলে তাহার আর কোন প্রশ্নই থাকে না। কিন্তু কোনো সময় কোন কারণে কোন বিষয়ের সত্যতায় সন্দেহ জাগিলে উহা সম্পর্কে পুনরায় প্রশ্ন উঠিতে পারে।'[২৪] আহমদ শরীফ সত্য সম্পর্কে বলেন– 'নতুন সত্যের, তথ্যের তত্ত্বের সন্ধান যিনি পাবেন, তিনি মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েই তা সানন্দে সগর্বে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করে কিংবা লিখে গোপনে বেনামে প্রকাশ করবেনই। ব্যক্তি লাঞ্ছিত কিংবা নিহত হতে পারেন। কিন্তু তাঁর উচ্চারিত বাণী, আবিষ্কৃত তথ্য, উপলব্ধ তত্ত্ব চিরকালের মানব সম্পদ হয়ে থাকে।'[২৫]

ধর্ম সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদ আরও বলেছেন, 'ধর্মের ইতিহাস পাঁচ হাজার বছরের, এর মধ্যে অজস্র ধর্ম প্রচারিত হয়েছে ও বাতিল হয়ে গেছে; কিন্তু মানুষ আছে কোটি বছর আগে থেকে, টিকে থাকবে বহু কোটি বছর। পৃথিবী ধ্বংসের আগে মানুষ হয়তো অন্য কোথাও পাড়ি জমাবে;– মানুষের সম্ভাবনা অনন্ত, দেবতাদের থেকে মানুষ অনেক বেশি প্রতিভাবান।[২৩]

'কোন বিষয় বা কোন ঘটনা একাধিকরূপে সত্য হইতে পারে না। একটি ঘটনা যখন দুই রকম বর্ণিত হয় তখন হয়ত উহার কোন একটি সত্য অপরটি মিথ্যা অথবা উভয়ই সমরূপ মিথ্যা; উভয়ই যুগপৎ সত্য হইতে পারে না– হয়ত সত্য অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়।'[২৬] হুমায়ুন আজাদের রচনায় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী থেকে সরপুটি মাছ, কচুরী ফুল, চাঁদ, একটি দোয়েলসহ নানা জিনিস স্থান পেয়েছে। একটি দোয়েল দেখে তিনি বলেছেন, 'শিশুর মুঠোর মতো ছোট্ট, আর মিষ্টি পাখি; ঘোলাটে রঙ ডানায়, বুক শাদাটে। ওরা কি বিবাহিত?'[২৭] একজন বড় লেখকের পক্ষে কেবল এমনভাবে চারপাশের ছোট–বড় সব কিছুকে সহজ করে তুলে আনা সম্ভব।

'মানবাধিকার ও লেখকের স্বাধীনতা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শিরোনোমে সর্বশেষ বক্তৃতায় হুমায়ুন আজাদ বলেছেন, 'আমরা যখন মানবাধিকার কথাটি ব্যবহার করি, তখন আমার কেন জানি মনে হয় আমরা মানুষের অর্ধেক নারীদের, বর্জন করে থাকি। মানবাধিকার এখনও পরুষের অধিকার বলে আমাদের দেশে গণ্য হয়ে থাকে।... এই মানুষ কোন স্বর্গ থেকে পতিত হয়নি। কোন স্বর্গই নেই। মানুষ কোন গন্ধম ফল খেয়ে কোন স্বর্গ থেকে তার চরিত্রহীনতার জন্য অভিশপ্ত হয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়নি। মানুষ অধঃপতিত নয়।...

...ডারউইন প্রস্তাব করেছিলেন, যা এখনও সমস্ত মানবজাতি গ্রহণ করেনি। যদিও বৈজ্ঞানিকভাবে তত্ত্বটি সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছে, আমি সেই তত্ত্বে বিশ্বাস করি।'[২৮] বিবর্তনবাদকে তিনি নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেন, যেন আমরা প্রতিক্রিয়াশীলদের মতো অধঃপতনের দিকে ফিরে না যাই, পরবর্তনশীলতাকে গ্রহণ করি।

সমাজ ও সভ্যতা সব মিলিয়ে সামনের দিকে এগোয়, উল্টো দিকে ফিরে যায় না, এটাই ইতিহাসের নিয়ম। হুমায়ুন আজাদ ইতিহাসের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলেন, ...আমি যখন ১৮ বা ১৮ শতকের বাংলাদেশের কথা ভাবি বা ভারতবর্ষের কথা ভাবি তখন অত্যন্ত ভয় বোধ করি। আমরা রক্ত–মাংস–শরীর শিউরে উঠে। তখন মানুষের কোন অধিকার ছিল না। তখন এদেশে শাসকের অধিকার ছিল, উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের অধিকার ছিল এবং কিছুটা উচ্চবর্ণের মুসলমানদের অধিকার ছিল। ...দুই মাইল দূরে বাজারে যাবে; কিন্তু বাজারে যেতে তার কমপক্ষে চার ঘন্টা সময় লাগত। কারণ যখন সে উচ্চবর্ণের কাউকে দেখত তাকে প্রণাম করতে হতো।'[২৯] এত সব অধিকারহীনতা দেখেও তিনি বিশ্বাস হারান না, আস্থা কেবল এক জায়গায়, সত্য একদিন জেগে উঠবেই, তাকে কেউ কোলের শিশুর মতো ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারবে না।

সংসদীয় রাজনীতি গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করে লেখক মন্তব্য করেন, 'যদি আমাদের সংসদ সদস্যরা মনে করে যে, আমরা দুই–তৃতীয়াংশ ভোটের ভিত্তিতে আজ এমন একটি আইন পাস করবো যে, এই সংসদে যারা সরকারী দলীয় সদস্য তারা চিরকাল জীবিত থাকবেন এবং চিরকাল ধরে বাংলাদেশ শাসন করবেন– এই আইনটা পাস করতে পারবে।...কিন্তু বিরোধীদলীয় হলেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হবে। আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এমনই। কয়েকদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ করছিলাম। তারা বলছিলেন আমরা ক্লাসে এখন ভেবেচিন্তে কথা বলি। ... আমরা অধিকার বলতে কী বুঝব?'[৩০] একজন মানুষ কতটা অধিকার বঞ্চিত সমাজ প্রত্যক্ষ করলে সংসদ সম্পর্কে এমন উক্তি করতে পারেন, শিক্ষক কতটুকু নিরাপত্তায় ভুগলে মনোবেদনা থাকলে এমন দীর্ঘশ্বাসের কথা উচ্চারণ করতে পারেন– যে কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তিই তা বুঝতে পারেন।

আজকাল সুশীল সমাজ নিয়ে প্রায় বিভিন্ন স্থানে আলোচনা শোনা যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সুশীল সমাজ কি? একটি সুন্দর গল্পের মাধ্যমে তিনি সুশীল সমাজের প্রকৃতি ও অবয়ব নিয়ে একটি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো, 'আমি ছেলেবেলায় একটি বাংলা ব্যাকরণ পড়েছি। সেখানে গোপাল নামে একটি চরিত্র ছিল। ব্যাকরণটি জানিয়েছে, গোপাল কলা খায়। ...আমাদের সুশীল সমাজও শুধু কলা

...সুশীল বলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝি যে একটি দুর্বল মানুষ; ভয়ে ভীত–সন্ত্রস্ত। সুন্দর ইস্ত্রি করা পোশাক পরে, মাথায় প্রচুর পরিমাণ তেল দেয় এবং মাঝখানে সিঁথি কাটে–– এই ধরনের একটি মানুষ। আমাদের জন্য আসলে অশ্লীল সমাজ প্রয়োজন। যে অশ্লীল সমাজ চিরকাল সমাজকে রূপান্তরিত করেছে, চিরকাল সমাজকে বদলে দিয়েছে এবং নতুন সমাজ স্থাপন করেছে।

খেয়ে থাকে। ...সুশীল বলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝি যে একটি দুর্বল মানুষ; ভয়ে ভীত–সন্ত্রস্ত। সুন্দর ইস্ত্রি করা পোশাক পরে, মাথায় প্রচুর পরিমাণ তেল দেয় এবং মাঝখানে সিঁথি কাটে–– এই ধরনের একটি মানুষ। আমাদের জন্য আসলে অশ্লীল সমাজ প্রয়োজন। যে অশ্লীল সমাজ চিরকাল সমাজকে রূপান্তরিত করেছে, চিরকাল সমাজকে বদলে দিয়েছে এবং নতুন সমাজ স্থাপন করেছে।

... বাংলাদেশে মানবাধিকার নেই, জাতিসংঘ আমাদের যত অধিকার দিক না কেন, তত অধিকারই আমাদের হয় না। আমাদের জীবন অধিকারহীনতার জীবন এবং শক্তিমানদের দ্বারা অধীনস্ত হওয়ার জীবন। ...মানবাধিকারের কথা যখনই বলি তখনই মনে হয় যেন ভুতের অধিকারের কথা বলা হচ্ছে।'[৩১] ... এ দেশে অধিকারের অর্থ এমনই নিরর্থক যে, কোন সুসভ্য ভাষায় তা বর্ণনা করা যায় না।

অন্যের অধিকার, মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে হুমায়ন আজাদ খুব সতর্ক ছিলেন। যুক্তির বদলে যুক্তি পেশ, তর্কের বদলে তর্ক– এ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি বলেছেন, 'আমরা বিরোধী মতাদর্শকে জ্ঞানের সাহায্যে, লেখার মাধ্যমে বাতিল করতে পারি, কিন্তু কেউ বিরোধী মতাদর্শ পোষণ করছে বলেই তাঁকে খুন করতে বা খুনের হুমকি দিতে পারি না। কিন্তু বাংলাদেশে এখন চিন্তার সাহায্যে চিন্তাকে বাতিল করার বদলে খুন বা

খুনের হুমকি দেয়াই রীতি হয়ে উঠেছে এবং আমি তার প্রধান শিকারে পরিণত হয়েছি।'[৩২] পেশীশক্তি দিয়ে কোনো কিছু জয় করা যায় না। ভয় দেখিয়ে কোনো কিছু জয় করা যায় না। আহমদ শরীফ বলেন, 'শক্তি দিয়ে যারা মানায়, তাদের শক্তি পশুশক্তি। পাশ্বাচার মানুষের কাম্য হতে পারে না।'[৩৩] 'ভীতিপ্রদ বা ভীতিজনক বস্তু হচ্ছে ভবিষ্যতের অমঙ্গল। আশা হচ্ছে মঙ্গলের সম্ভাবনা।'[৩৪] সুতরাং এত ভয়ের মধ্যে তিনি আশা করেছেন, ক্লান্ত হন নি। আমরা বেঁচে আছি তো আশা আছে বলেই এবং ভবিষ্যতেও যারা সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন, অনন্ত আশা আছে বলেই।

যুগে যুগে সক্রেটিস, ব্রুনো, গ্যালিলিও জন্মগ্রহণ করেন, এই পলি মাটির দেশে জন্ম নিয়ে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, নজরুল, বেগম রোকেয়া, আরজ আলী মাতুব্বর, আহমদ শরীফরা যে নবযাত্রার সূচনা করেন; হুমায়ুন আজাদ তাদের সুযোগ্য উত্তরসুরী। হুমায়ুন আজাদ–হুমায়ুন আজাদই। তাঁর সঙ্গে কারো তুলনা করব না। কারণ তিনি রাঢ়ীখাল, কামার গাঁও থেকে গ্রহ–নক্ষত্র নিয়ে লিখেছেন। লিখেছেন রাজনীতি, রাজনীতিবিদ, সংসদ, বিশ্ববিদ্যালয়, সুশীল সমাজ, ধর্ম, মৌলবাদ, নারী অধিকার, বঞ্চিত মানুষ, প্রতিক্রিয়াশীলসহ বহুবিধ বিষয় নিয়ে। তিনি যা লিখেছেন তা শুধু বিশুদ্ধতা ও পরিশীলতায় অনন্য, এমন দাবি করব না। তাঁর সৃষ্টি সমগ্রের মধ্যে সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে থাকতে পারে স্ববিরোধিতাও। সেই আলোচনা এ নিবন্ধে সম্ভব নয়। সে দায়িত্ব রইলো সাহিত্য সমালোচক ও গবেষকদের ওপর।

তিনি কুসংস্কার ও কূপমণ্ডূকতার অচলায়তন ভেঙ্গে সৃষ্টির যে নব উম্মাদনা ও জোয়ার এনেছেন তাতে অবগাহন করার জন্য আমি নতুন প্রজন্মের সাহিত্যসেবী, রাজনৈতিক কর্মীসহ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি যে সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন, প্রগতিশীল ও মুক্তচিন্তার ধারক–বাহকদের সেই অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে হবে। প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাজিত করতে পারলেই প্রগতি সামনে এগুবে, জয়ী হবে মুক্তচিন্তার পতাকাবাহী লড়াকু মানুষেরা। লেখকের স্বাধীনতা সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার স্বাদ পূরণ হবে, প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এখন আমরা রুশোর মতো বলতে পারি, 'স্বাধীনতাকে হারানোর জন্য মানুষ তার স্বাধীনতাকে সমর্পণ করেনি। তা সে করতে পারে না কারণ 'মানুষ' কথার অর্থই হচ্ছে স্বাধীনতা। রুশোর ভাষায় 'মানুষ = স্বাধীনতা'। মানুষ মানে স্বাধীনতা। মানুষ মানে দাস নয়।'[৩৪] রুশো আরও বলেন, 'মুর্খতা কোনো অধিকারের জন্ম দিতে পারে না।'[৩৫] তিনি আরো বলেছেন, 'একজন মানুষ যখন তার স্বাধীনতাকে বিসর্জন দেয়, তখন সে তার অনিবার্য মনুষ্যত্বকেই বিসর্জন দেয়। সে বিসর্জন দেয় সকল অধিকারকে। সে বিসর্জন দেয় মানুষ হবার দায়িত্বকে।'[৩৬] ভিন্ন মত প্রকাশ ও স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার সবাইকে দিতে হবে, তবেই 'শত ফুল' ফুটবে। মুক্তচিন্তা ও যুক্তিবাদের প্রাণে স্পন্দন আসবে। লেখকের স্বাধীনতা ও প্রগতিশীলতার জয় হবে। বিজয়ী হবে নিপীড়িত মানুষ।

তথ্যসূত্র :

১-৫। নারী, হুমায়ুন আজাদ

৬। মাও সেতুঙের রচনাবলীর নির্বাচিত পাঠ।

৭-১১। নারী, হুমায়ুন আজাদ

১২-১৪। পাক সার জমিন বাদ সাদ, হুমায়ুন আজাদ

১৫, ১৬। নির্বাচিত প্রবন্ধ, আহমদ শরীফ

১৭। শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ, হুমায়ুন আজাদ

১৮। নির্বাচিত প্রবন্ধ, হুমায়ুন আজাদ

১৯। নারী, হুমায়ুন আজাদ

২০-২২। সত্যের সন্ধান, আরজ আলী মাতুব্বর।

২৩। নারী, হুমায়ুন আজাদ

২৪। সত্যের সন্ধান, আরজ আলী মাতুব্বর।

২৫। নির্বাচিত প্রবন্ধ, আহমদ শরীফ

২৬। সত্যের সন্ধান, আরজ আলী মাতুব্বর

২৭, ২৮। আমার নতুন জন্ম

২৯-৩২। নির্বাচিত প্রবন্ধ, হুমায়ুন আজাদ

৩৩। নির্বাচিত প্রবন্ধ, আহমদ শরীফ

৩৪। প্লেটোর সংলাপ, সরদার ফজলুল করিম অনুদিত

৩৫, ৩৬। রুশোর সোশ্যাল কনট্রাক্ট

(জেরার্ড হপকিনস কৃত ইংরেজি অনুবাদের অনুসরণে বাংলা অনুবাদ)

জাঁ জ্যাক রুশো : ১৭১২–১৭৭৪, সরদার ফজলুল করিম

শ্রদ্ধাঞ্জলি

অগ্নিযুগের শহীদ ক্ষুদিরাম

অজয় রায়

ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্নিযুগের শহীদ। পুরো নাম ক্ষুদিরাম বসু। পিতা ত্রৈলোক্যনাথ ও মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া। জন্মেছিলেন ১৮৮৯ সালের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মেদিনীপুর শহর সংলগ্ন হরিহরপুর গ্রামে। পর পর দু'পুত্র সন্তানের অকাল মৃত্যুর পর এই পুত্রলাভে জননী যৎপরোনাস্তি আনন্দ বিহ্বল হলেও ছিলেন সতত শঙ্কাগ্রস্ত 'এই বুঝি আবারও সন্তানকে হারান'। ক্ষুদিরামের ছিল তিন বোন অপরূপা, সরোজিনী এবং ননীবালা। পুত্রের দীর্ঘায়ু কামনায় মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া সন্তানের ওপর সকল লৌকিক দাবি পরিত্যাগ করে বড় মেয়ে অপরূপার কাছে এক মুঠো খুদের বিনিময়ে নবজাতক সন্তানের প্রতিপালনের দায়িত্ব তুলে দেন। খুদের বিনিময়ে কেনা বলে নবজাতকের নাম রাখা হল ক্ষুদিরাম। এত কিছুর পরও কিন্তু ক্ষুদিরামের অকাল মৃত্যু ঠেকান গেল না। মাত্র ১৮ বছর ৭ মাস ১০ দিন বয়সে ব্রিটিশের ফাঁসির দড়িতে তাকে মৃত্যু বরণ করতে হয়। অপরাধ ? সে কথায় পরে আসছি।

ক্ষুদিরামের বাল্যজীবন

মাত্র ছয় বছর বয়সে ক্ষুদিরাম মাতৃ-পিতৃহারা হন। আগেই বলেছি যে মার কাছ থেকে ক্ষুদিরামের প্রতিপালনের দায়িত্ব পান বড়বোন অপরূপা দেবী। তাঁর স্বামী অমৃতলাল রায় দাসপুর থানাধীন গ্রামের তাঁর নিজ বাড়িতে ক্ষুদিরাম ও তার ছোড়দি ননীবালাকে নিয়ে যান। অমৃতলাল ছিলেন ঘাটাল দেয়ানী আদালতের একজন কর্মচারী। গ্রামেই গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পাঠশালাতে শুরু হয় বালক ক্ষুদিরামের প্রাথমিক শিক্ষা। ঘাটাল থেকে বড়বোনের জামাই তমলুকে বদলী হয়ে এলে ক্ষুদিরামকেও চলে আসতে হয় এখানে। তাকে তমলুক হ্যামিল্টন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ১৯০১ সালে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়।

এ সময় বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ (১৯০২) এবং নিবেদিতা ঘোষ (১৯০৩) মেদিনীপুর শহরে এসে স্বাধীনতার লক্ষ্যে গুপ্ত সমিতি গঠন করে যান। জেলার যুব সমাজকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে এ ধরনের গুপ্ত সমিতিতে সম্পৃক্ত হতে তারা উদ্বুদ্ধ করেন। ক্ষুদিরামও এ ধরনের সমিতির কাজে জড়িয়ে পড়েন অত্যপ্ল কালে। আবারও ভগ্নিপতী ১৯০৪ সালে মেদিনীপুর শহরে বদলী হলে, ক্ষুদিরামও মেদিনীপুর শহরে এসে কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। সে সময় তমলুকে কলেরা মহামারী আকার ধারণ করলে ক্ষুদিরাম আর্ত মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ